প্রবন্ধ

গাউসে পাকের জীবন ও কর্ম

শাহ্জাহান মুহাম্মদ ইসমাইল

পূর্ব প্রকাশিতের পর

মুহিউদ্দীন খেতাব লাভ

৫১১ হিজরির কোন শুক্রবারে শুভক্ষণে হযরত গাউসে পাককে (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) আল্লাহর পক্ষ থেকে 'মুহিউদ্দিন' (ধর্মের পুনর্জীবনদানকারী) খেতাবে ভূষিত করা হলো। আধ্যাত্মিক সাধনায় পেলেন পূর্ণতার স্বীকৃতি। পরিগণিত হলেন অলিকুল শিরোমণি হিসেবে। তিনি যাচ্ছিলেন মসজিদের দিকে। দেখতে পেলেন রাস্তায় ধরাশায়ী অসুস্থ মৃতপ্রায় এক বয়োবৃদ্ধ লোক। তাঁর কাছে সাহায্য চাচ্ছে। তিনি তাঁকে হাত দিয়ে ধরে উঠাতে গেলেন, অমনি ঐ ব্যক্তি সুস্থ-সবল এক যুবকে পরিণত হলো। তিনি অবাক বিস্ময়ে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তুমি? উত্তর এলো "আমি নূরনবীর প্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম। আপনার পবিত্র স্পর্শে আল্লাহ্ পাক আমাকে নতুন জীবন দান করেছেন। আপনাকে ধন্যবাদ। আজ থেকে আপনি এ জগতে 'মুহিউদ্দিন' নামে পরিচিত হবেন। একথা বলেই লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

বড়পীর হযরত গাউসে পাক (রহ.)'র নাম ও খেতাবসমূহ

হযরত শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র অনেক খেতাব ছিল। সর্ব প্রধান খেতাব হলো 'পীরানে পীর' (পীরদের পীর), 'পীরে দস্তগীর' (সাহায্যকারী পীর), 'মাহবুবে সুবহানী' (পবিত্র আল্লাহর প্রেমাস্পদ), গাউসুল আযম (মহান সাহায্যকারী), 'মুহিউদ্দিন' (ধর্মের পুনর্জীবিতকারী) ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণত তিনি "হযরত বড় পীর সাহেব" নামেই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর ভক্তগণ সব সময় তাঁকে 'দরবেশদের সুলতানরূপে' অভিহিত করে থাকেন এবং মুশাহিদুল্লাহ্, আমরুল্লাহ্, ফাদ্বলুল্লাহ্, আমানুল্লাহ্, নুরুল্লাহ্, কুতুবুল আক্বতাব, সাইফুল্লাহ্, ফরমানুল্লাহ্ বুরহানুল্লাহ, সিবগাতুল্লাহ্, প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করে থাকেন। এছাড়াও জমীনের মধ্যে তাঁর উপাধি 'মহিউদ্দিন' আর আসমানে তিনি 'বাজে আশহাব' নামে পরিচিত।

হযরত গাউসে পাকের (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) অনেকগুলি বরকতময় নাম রয়েছে। তন্মধ্যে নিচের এগারটি নাম অজিফা হিসেবে পঠিত হয়ে থাকে। ১. সৈয়্যদ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী, ২. শেখ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী, ৩. সুলতান মুহিউদ্দিন আবদুল কাদির জিলানী, ৪. ওলী মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী, ৫. বাদশাহ্ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী, ৬. মাখদুম মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী, ৭. মাওলানা মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী, ৮. খাজা মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী, ৯. মাহবুব মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী, ১০. কুতুব মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী, ১১. গাউস মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী।

এ রকম তাঁর ৯৯টি উপাধির কথা জানা যায়। এছাড়া উনবিংশ শতকের সুফী সাধক হযরত আবদুর রহমান চৌরভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কর্তৃক ৩০খণ্ডে রচিত বিশ্ব বিখ্যাত অদ্বিতীয় দরূদ শরীফের সংকলন 'মজমুয়ায়ে সালাওয়াতির রাসূল' গ্রন্থের ৩০ তম খণ্ডে এবং মুজহেরে জামালে মুস্তফায়ী গ্রন্থে তাঁর শতাধিক নাম উল্লিখিত হয়েছে।

বাবুল আযান মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনা

৫১৩ হিজরীতে তদীয় পীর ও মুর্শীদ শায়খ আবু সাঈদ মুবারক মাখযুমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর ইন্তিকাল হলে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বাবুল আযান মাদ্‌রাসা পরিচালনার গুরু দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর হাতে। আমৃত্যু পালন করে গেছেন তিনি এ মহান দায়িত্ব।

সংসার জীবনে প্রবেশ

ইবাদত বন্দেগীতে ব্যাঘাত ঘটার আশংকায় হযরত গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কখনোই সংসারের ঝামেলায় নিজেকে জড়াতে চাননি। কিন্তু ৫২১ হিজরীতে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে স্বপ্নযোগে দেখা দিয়ে নির্দেশ দিলেন শাদী করার জন্য। সাথে সাথে তিনি নবী করীমের সুন্নাত পালনে তৎপর হলেন। বিবাহ করে ঘরে এনে তুলেন সবংশীয়া সৈয়্যদজাদী সুশীলা এক রমণীকে। শুরু হলো তাঁর জীবনের আরেক নতুন অধ্যায় যার নাম সংসার জীবন।

একে একে চার রমণীর পানি গ্রহণ করেছিলেন তিনি। আল্লাহ্ পাক তাঁকে ৪৯ জন সন্তান সন্ততি দান করেছিলেন। তার পুত্রের সংখ্যা ছিল ২০ জন। তাঁরাও

ছিলেন তাঁদের পিতার মতই জ্ঞানী, নেক স্বভাব সম্পন্ন ও ওলী সুলভগুণাবলীর অধিকারী।

ওয়াজ মাহফিলে বক্তৃতা প্রদান

ঐ একই বছর নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আরেকটি স্বপ্নাদেশ পেলেন হযরত গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি। নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এবার নির্দেশ দিলেন প্রকাশ্যে ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে তাঁর উম্মতগণকে হিদায়ত ও নসীহতের বাণী শোনানোর জন্য। তিনি নিজে অনারব ছিলেন বিধায় জনসমক্ষে প্রকাশ্যভাবে ওয়াজ নসীহত করতে সংকোচ করতেন। এবার নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে তাঁর মুখে পবিত্র থুথু মুবারক দিয়ে বক্তৃতা করার জন্য অভয় বাণী শোনালেন। নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র অসাধারণ বরকতময় থুথুর প্রভাবে তাঁর মধ্যে ফিরে এলো আত্মবিশ্বাস ও জনসভায় বক্তৃতা করার প্রেরণা। তিনি শুরু করলেন প্রকাশ্যে ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত দিশেহারা উম্মতে মুহাম্মদীকে হিদায়ত ও নসীহতের বাণী শোনাবার কাজ। এভাবে একটানা পরবর্তী চল্লিশ বছর ধরে চললো ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে তাঁর হিদায়ত ও দাওয়াতী কর্মকাণ্ড।

এলো সেই যুগান্তকারী মহা ঘোষণা

প্রকাশ্য ওয়াজ মাহফিলে একদিন হযরত গাউসে পাকের (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) পবিত্র মুখে উচ্চারিত হলো অভাবনীয় এক কথা। তিনি বললেন, ''কাদ্বামী হাযিহী 'আলা রাক্বাবাতি কুল্লি ওয়ালিয়্যিল্লাহ্'' অর্থাৎ আমার চরণ আল্লাহর সকল অলীর স্কন্ধোপরি। অবাক বিস্ময়ে হতবাক তাঁর সম্মুখের বিশাল জনসমুদ্র। তখন শুধু সে সময়ের অলীগণই নয় বরং গাউসে পাকের পূর্ববর্তী সময়ের যে সকল অলী দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছিলেন তাঁরা নিজ নিজ কবর থেকে এবং যেসব অলী তখনও পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেননি এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা অলী হিসেবে দুনিয়াতে তাশরীফ আনবেন তাঁরাও রূহজগত থেকে নিজ গর্দান ঝুঁকিয়ে দিয়েছিলেন উক্ত রূহানী নির্দেশের প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ। রূহানী জগতের এ নির্দেশ শুনা মাত্রই পৃথিবীর সকল অলী সসম্ভ্রমে একযোগে বলে উঠলেন, ''সাদ্দাকনা ওয়া আমান্না''। অর্থাৎ আমরা মেনে নিচ্ছি, আপনি সত্যই বলেছেন।

শুধু তাই নয় গাউসুল আযমের (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এ ঘোষণা কসিদায়ে গাউসিয়াতেও প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেন, ''আনাল হাসানী ওয়াল মাখদা মাক্বামী, ওয়া আকদামী আলা উনুক্বির রিজালী''। অর্থাৎ বংশে আমি হাসানী-আবাস আমার মাখদা', সর্বজনের স্কন্ধোপরি আমার চরণ শোভা পায়। তাঁর এ ঘোষণা নত শিরে কবুল করেছিলেন তরীকত জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন আজমিরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি। গরীবে নওয়াজ হযরত খাজা আজমিরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, এ ঘোষণা শোনা মাত্রই বলে উঠলেন, ''কদমুকা আলা আইনি ওয়া রাসী'' অর্থাৎ আপনার কদম মুবারক আমার দু'চোখ ও মাথার উপর। হযরত শায়খ কুতুব রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, ''গাউসে পাকের (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) উপরোক্ত ঘোষণার সাথে সাথে মক্কা-মদীনা শরীফের ১৭ জন, ইরাকে ৬০ জন, ইডেনে ৪০জন, সিরিয়াতে ৩০ জন, মিশরে ২০জন, পশ্চিমাঞ্চলীয় অন্যান্য দেশে ২৭ জন, পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহে ২৩ জন, আবিসিনিয়াতে ১১ জন, ইয়াজুজ-মাজুজের এলাকাতে ১৭ জন, কোহেক্বাফে ৪০ জন এবং বাহরে মহীত্বে ৪০ জন, এভাবে বিশ্বব্যাপী শুধুমাত্র নিজের যুগের জন্য নন বরং তাঁর পূর্বাপর সকল যুগের জন্যই গাউসুল আযম হিসেবে অধিষ্ঠিত রয়েছে। কসিদায়ে গাউসিয়ায় তাঁর এ চিরন্তন ক্ষমতার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ''ওয়া ওয়াল্লানী আলাল আক্বতাবে জাম'আন, ফাহুকমী নাফিযুন ফী কুল্লি-হালী'' অর্থাৎ আমাকে জামানার সকল কুতুবের উপর কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে এবং আমার আদেশ সর্বকালে জারী থাকবে। জন্মের পূর্বেই তাঁর জন্য এ গৌরবময় আসন স্থির ছিল মর্মে কসিদায়ে গাউসিয়ার এক পংক্তিতে বলা হয়েছে- ''বিলাদুল্লা-হি মুলকী তাহতা হুকমী, ওয়া ওয়াক্তী ক্বাবলা ক্বাবলী সাফালী''। অর্থাৎ আল্লাহর রাজ্য আমার রাজত্ব, আমার আদেশের অধীন এবং আমার জন্মের বহু পূর্বেই আমার জন্য শ্রেষ্ঠ মর্যাদার এ আসন স্থির করা ছিল। এ কারণেই দেখা যায় হযরত সায়্যিদুনা গাউসুল আযমের (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) জন্মের তিনশত বছর পূর্বের বিশিষ্ট সাধক হযরত আবু ইয়াজিদ তাইফুর ওরফে বায়েজিদ বোস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি (ওফাত১৩৪ হিজরি) একদা মুরীদের সাথে আলাপরত অবস্থায় নিজের মাথা সামনের দিকে নত করে দিয়ে বলে উঠেছিলেন ''তাঁর কদম আমার মস্তকোপরি।'' এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে মুরীদানদিগকে তিনি জানান, ''আজ থেকে তিনশত বছর পর এমন একজন অলী দুনিয়ায় শুভাগমন করবেন, যিনি ঘোষণা দেবেন, ''আমার চরণ সকল অলীর স্কন্ধোপরি''।

সে সময় আমি পৃথিবীতে বেঁচে থাকবোনা বিধায় আগাম তাঁর সে ঘোষণার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে গেলাম। একইভাবে হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিও (জন্ম ২২৮হিজরি, ওফাত ২৭ রজব, ২৯৮ হিজরি) হযরত সাইয়্যিদিনা গাউসুল আযম রাহমাতুল্লাহি আলায়হির সম্মানে আগাম স্বীয় মস্তককে অবনত করে দিয়েছিলেন। অবশ্য, সাহাবাই কেরাম আহলে বায়ত ও তাবে'ঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এ ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত নন।

গাউসুল আযম স্বীকৃতি লাভ

সর্বজনমান্য আলেমে দ্বীন হযরত মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বড়পীর হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানীকে (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) 'গাউসদের গাউস' বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বিখ্যাত 'আখবারুল আখয়ার' গ্রন্থে তাঁকে 'গাউসুল আযম', গাউসুস সাক্বালাইন' বলে অভিহিত করে গাউসে পাককে (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি "কুন-ফায়াকুন" অর্থাৎ হও বলতে হয়ে যাওয়ার ক্ষমতার অধিকারী বলে মন্তব্য করেছেন। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভীও (জন্ম ১১১৫ হিজরি, ওফাত ১১৭৬) তাঁকে 'গাউসুল আযম' বলেছেন। হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী (জন্ম ১২৩১ হিজরি, ওফাত ১৩১৫হিজরি, 'শামায়েলে এমদাদিয়া' গ্রন্থে তাঁকে 'গাউসুল আযম' ও দ্বীনের ডুবন্ত জাহাজের উদ্ধারকারী' বলে উল্লেখ করেছেন। মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী 'সিরাতুল মুস্তাকিম' গ্রন্থের ৩৭২ পৃষ্ঠায় তাঁকে গাউসুস সাক্বালাইন' নামে অভিহিত করেছেন। মৌলভী খলীল আহমেদ আম্বেটবীর 'বারাহীনে কাতেয়া' গ্রন্থের ৯১ পৃষ্ঠায় তাঁকে 'গাউসুল আযম' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল উক্তি গাউসুল আযম দস্তগীর বড়পীর হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির গাউসিয়াতের অসাধারণ ব্যাপকতার প্রমাণ বহন করে।

কাদেরিয়া তরীকার প্রবর্তন

আরবী ত্বরীকা শব্দের অর্থ রাস্তা। ইসলামী পরিভাষায় "সূফিগণ যে রাস্তা ধরে আল্লাহর নৈকট্য সন্ধান করেন, সেটাই ত্বরীকা বা ত্বরীকত নামে অভিহিত।" যুগে যুগে প্রসিদ্ধ শায়খ, গাউস ও কুতুবগণ এধরনের যেসব ত্বরীকা উম্মতে মুহাম্মদীকে উপহার দিয়েছেন তাই ঐ সকল ত্বরীকার প্রতিষ্ঠাতাদের নাম ও উপাধি অনুসারে পরিচিতি লাভ করেছে। মুসলিম সমাজের অনুসৃত এ সকল ত্বরীকার মধ্যে গাউসুল আযম দস্তগীর বড়পীর হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি প্রবর্তিত ত্বরীকা তাঁর নামানুসারে "কাদেরিয়া ত্বরীকা" নামে বিশ্বময় সুপরিচিত। সুলতানুল হিন্দ গরীব নেওয়াজ হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশ্‌তীর (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) (জন্ম ৫৩৭ হিজরি, ওফাত ৬২৭ হিজরি) অনুসৃত ত্বরীকার নাম "চিশতিয়া ত্বরীকা", হযরত শায়খ খাজা বাহাউদ্দীন ইবনে মাহমুদ বোখারী নক্সবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি (জন্ম ৭১৭ হিজরি, ওফাত ৭৯১ হিজরি) প্রবর্তিত ত্বরীকার নাম "নক্সবন্দীয়া ত্বরীকা"। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী ওরফে হযরত শায়খ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি (জন্ম ৯৭১ হিজরি, ওফাত ১০৩৪ হিজরি) ত্বরীকার নাম হয়েছে "মুজাদ্দেদিয়া ত্বারীকা" এবং হযরত শায়খ সিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) (জন্ম ৫৪৯ হিজরি, ওফাত ৫৮৭) প্রবর্তিত ত্বরীকাটি "সোহরাওয়ার্দীয়া ত্বরীকা" নামে অভিহিত হয়েছে। উল্লেখ্য এ ত্বরীকাসমূহের সবকটিই সহীহ ত্বরীকা হিসেবে সারা মুসলিম জাহানে স্বীকৃত ও বহুল সমাদৃত। তবে এগুলোর মধ্যে "কাদেরিয়া ত্বারীকা" সর্বপ্রধান ত্বরীকা বা সিলসিলারূপে গণ্য হয়ে আসছে।

কাদেরিয়া ত্বরীকার খাস তালিম

পবিত্র কালেমা শরীফ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" এ বার হরফের তালিম কাদেরিয়া ত্বরীকার খাস তালিম। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ তালিম হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে প্রদান করেন। তাঁর মাধ্যমে এই তালিম হযরত হাসান বসরীর (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) নিকট আসে। পরবর্তীতে এই তালিম সিনা থেকে সিনায় গুপ্তভাবে জারী ছিল। কিন্তু হযরত গাউসুল আযম বড়পীর শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এই তালিমকে সুশৃংখলিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করেন এবং গুপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করে খাস মুরীদদিগকে প্রদান করেন। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" এই বার হরফের মধ্যে দুনিয়ার সমস্ত রহস্য লুক্কায়িত। এই হরফই বিশ্বগজতের মূল কারণ ও উৎস। তাওহীদের প্রকৃত রূপ এই পবিত্র কালেমা। এই বার হরফের মধ্যে কোন নোকতা নাই। নোকতা শূন্য হরফের সাহায্যে কালেমার সৃষ্টি কেন হলো? তা গভীর রহস্যে ঢাকা। এই কালেমাকে জানলে, চিনলে ও সঠিকভাবে তাহকিক করে পড়লে, তাঁর কাছে সকল রহস্যের দ্বার উম্মোচিত হয়ে যাবে। যিনি এই কালেমার রহস্য জানেন, তিনিই 'আরিফ-ই রব্বানী' ও 'অলীয়ে কামিল' এর মর্যাদায় আসীন হন। এইরূপ জ্ঞানীর জন্য পবিত্র হাদীস শরীফে

বলা হয়েছে, "যে তাহকিক করে জীবনে একটি বারের জন্য কালেমা পাঠ করেছে, তাঁর জন্য দোজখের আগুন হারাম।"

এ ছাড়া কলেমার মধ্যে পাঁচটি অংশ রয়েছে। কলেমার এ পাঁচ অংশ যাবতীয় মৌলিক পদার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট ও মিশ্রিত। কলেমার এই পাঁচটি অংশেই সমস্ত বিশ্বজগত, দৃশ্য-অদৃশ্য, জানা-অজানা, ভূত-ভবিষ্যত-বর্তমান এবং সমস্ত রহস্যের মূল বিকাশ লাভ করেছে। এই কালেমাই বিশ্ব সংসারে মুল ও নূর-ই মুহাম্মদীর মূল উৎস। এই তালিম না পাওয়া পর্যন্ত কেউ সূফি সাধক হওয়ার উপযুক্ত হন না।

কাদেরিয়া ত্বরীকা পন্থীদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন স্থানে কাদেরিয়া সূফিরা বিভিন্ন জিনিসকে তাঁদের ত্বরীকার প্রতীক রূপে ব্যহার করেন। যেমন, তুরস্কের সূফিরা সবুজ গোলাপ ফুলকে প্রতীক রূপে গ্রহণ করেন। কোন ব্যক্তি এই ত্বরীকা গ্রহণ করতে চাইলে, শিষ্যত্ব গ্রহণের এক বছর পর তাঁকে একটি পশমী টুপীর সঙ্গে আঠার পাপড়ি বিশিষ্ট একটি সবুজ গোলাপ ফুলের প্রতীক সংযুক্ত করে দেয়া হয়। সবুজ রং পছন্দ করলেও অন্যান্য রং ব্যবহারে তাঁদের আপত্তি নাই। মিসরের সূফিরা আবার সাদা রং পছন্দ করেন। পড়পীর সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কর্তৃক 'ফুতুহাত-ই রাব্বানীয়া' গ্রন্থে দেখা যায় যে, কোন লোক কাদেরিয়া তরীকা গ্রহণ করতে চাইলে তাকে দিনে রোযা রাখতে এবং রাতে আল্লাহর উপাসনায় মশগুল থাকতে বলা হয়েছে। এই অবস্থায় তাঁকে চল্লিশ দিন থাকতে হয়। চল্লিশ দিন পর ঐ ব্যক্তিকে তাঁর শিক্ষানবীশর সত্যতা প্রমাণের জন্য পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বুঝতে হবে যে, তাঁর শিক্ষানবীশীর কাল শেষ হয়েছে। তিনি কাদেরিয়া ত্বরীকায় আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেছেন।'

কেন তিনি বড় পীর?

গাউস শব্দের অর্থ হলো সাহায্যকারী বা ত্রাণকর্তা। নক্সবন্দীয়া ত্বরীকার বিখ্যাত কিতাব "ইরগামুল মুরীদীন" গ্রন্থে বলা হয়েছে, "আল গাউসু হুয়া কুতুবুল্লাযী ইউসতাগাসু বিহি।" অর্থাৎ গাউস ঐ কুতুবকে বলা হয়ে থাকে যার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে তা পাওয়া যায়। কাদেরিয়া ত্বরীকার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হলো অপরাপর ত্বরীকাসমূহের প্রতিষ্ঠাতা ও শায়খবৃন্দ গাউসুল আযম দস্তগীর বড়পীর হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানীর (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) কদমের নিচে নিজেদের গর্দান অবনত করে দিয়েছেন। বস্তুত বড়পীর হযরত গাউসে পাক (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ছিলেন 'গাউসুস সাক্বালাইন' অর্থাৎ জ্বীন ও মানব জাতির ত্রাণকর্তা এবং 'গাউসুল আযম' অর্থাৎ গাউসদের অধিপতি।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী মক্কীর (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) মতে "হযরত সাইয়্যিদিনা ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর পর এবং কিয়ামতের পূর্বে ইমাম মাহদীর (আলায়হিস্ সালাম) সময় পর্যন্ত তিনিই থাকবেন পূর্বাপর সকল অলী, গাউস, কুতুবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আসনে।"

মুজাদ্দিদে আলফে সানী ওরফে হযরত শায়খ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দির (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) মতে, "সকল স্তরের অলী, গাউস, কুতুব নির্বিশেষে সকলেই হযরত গাউসে পাকের (রাহমাতুল্লাহি আলাহি) প্রদত্ত ফুয়ূজাত ও মেহেরবানীর মুখাপেক্ষী। চন্দ্র যেমন সূর্য হতে আলো গ্রহণ করে নিজেকে আলোকিত করে ঠিক তেমনি আমিও হযরত গাউসে পাকের (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) কাছ হতে ফয়েজ অর্জন করে থাকি।"

[মাকতুবাত ৩য় খণ্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা]

একই পুস্তকের ১২৩ নং মাকতুবে বলা হয়েছে, "হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানীর (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) জমানা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত অলী, কুতুব, আবদাল, আওতাদ, নুজাবা, নুকাবা, গাউস ও মুজাদ্দিদের আবির্ভাব হবে, তাঁদের সকলেই ত্বরীকতের ফয়েজ, বরকত ও বেলায়ত অর্জনের ক্ষেত্রে গাউসুল আযমের (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) মুখাপেক্ষী। তাঁর মাধ্যম ছাড়া কিয়ামত পর্যন্ত কোন ব্যক্তি অলী হতে পারবে না।"

চিশতিয়া ত্বরীকার মহান অলী গরীব নওয়াজ হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি সর্বপ্রথম বিনা বাক্যে গাউসে পাকের (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন বিধায় তিনি তাঁকে হিন্দুস্থানের বেলায়ত প্রদান পূর্বক "সুলতানুল হিন্দ) উপাধিতে বিভূষিত করেছিলেন।

নক্সবন্দীয়া ত্বরীকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খাজা বাহাউদ্দিন ইবনে মাহমুদ বোখারী নক্সবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর "নক্সবন্দী' উপাধিটিই তো হযরত গাউসে পাকের (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) দান। হযরত খাজা বাহাউদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ইসমে আজমের সন্ধানে যখন সম্পূর্ণ দিশেহারা অবস্থায় বনে জঙ্গলে পাগল প্রায় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন হঠাৎ হযরত খাজা খিজির

আলায়হিস্ সালাম তাঁকে সাক্ষাৎ দান করে 'আল গিয়াস, ইয়া মাহবুবে সুবহানী' এ দোয়া পড়ে হযরত গাউসে পাকের (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) সাহায্য প্রার্থনা করার উপদেশ দেন। তিনি হযরত খাজা খিজির আলায়হিস্ সালাম-এর উপদেশ মুতাবিক কাজ করে হযরত গাউসে পাকের (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) সাক্ষাৎ লাভ করেন। হযরত গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর নিজ হাতের তালুতে আল্লাহু নামের অংকিত নকশা প্রদর্শন করলে হযরত খাজা বাহাউদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলায়হি সে নকশা স্বীয় অন্তরে গেঁথে নেন। গাউসে পাকের দোয়ার বরকতে সেদিন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ইসমে আজমের সন্ধান লাভ ও তার নকশা হৃদেয় ধারণ করে ধন্য হয়েছিলেন। তখন থেকেই তাঁর নাম নক্সবন্দী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। গাউসে পাকের (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) দোয়ার ফসল সোহরাওয়ার্দীয়া ত্বরীকার প্রবক্তা হযরত শায়খ সিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীকে (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) (জন্ম ৫৪৯ হিজরী, ওফাত ৫৮৭ হিজরি) বড়পীর হযরত গাউসে পাক (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইরাকের বেলায়ত দানে ধন্য করেছিলেন।

গাউসে পাকের (রহ.) কারামতসমূহ

পবিত্র হাদীস শরীফে আছে, "কারামাতু আউলিয়ায়ি হাক্কুন, এহানাতুল আউলিয়ায়ি কুফরুন" অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র অলীগণের কারামাত সত্য, তাঁদের কারামাতকে অস্বীকার, উপহাস বা ইনকার করা কুফুরী।" আসলে কারামাত প্রদর্শন করতে পারা কোন মুমিন ব্যক্তির অলী হওয়ার পক্ষে প্রধান শর্ত নয়। এখানে দেখা দরকার, সে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে ইসলামী শরীয়তের বিধিবিধানের অনুসারী কিনা? যদি উক্ত ব্যক্তির ইসলামী শরীয়তের পূর্ণ অনুসরণ পাওয়া যায় তবেই কেবলমাত্র তাঁর প্রদর্শিত অলৌকিক কার্যাবলীকে কারামাত হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবে। কারণ, কারো অলী হওয়ার প্রধান নিদর্শন হচ্ছে তাঁকে দেখলে মনে আল্লাহর ভয়-ভীতি ও আল্লাহর জন্য প্রেম ভালোবাসা জাগ্রত হবে। অর্থাৎ যাকে দেখলে মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় ও প্রেম জাগরিত হয় তিনিই হলেন অলী, কোন অলীর পক্ষে কারামত প্রদর্শন করাটা মোটেই জরুরি নয়। মূল বিষয় হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের বিধিবিধান সমূহের পূর্ণ অনুসরণের ব্যাপারে অটল থাকা। ফুল গাছের জন্য যেমন ফলের জন্ম দেয়াটা মোটেই প্রয়োজনীয় নয়। ঠিক তেমনি কারামত প্রদর্শন করাটাও কোন অলীর জন্য অতি জরুরি কোন বিষয় নয়। সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় অলীগণ কর্তৃক কারামত প্রদর্শিত হয়ে থাকে। তাই আগে একথা ভেবে দেখতে হবে যে, কার কাছ থেকে কারামত প্রকাশিত হচ্ছে? কারামতধারী ব্যক্তি কি ইমানদার, নাকি কাফির? কারণ কাফির ব্যক্তির প্রদর্শিত অলৌকিক কার্যাবালী মোটেই কারামত হিসেবে বিবেচ্য নয়। কারণ কঠোর সাধনার বলে কিংবা শয়তানী শক্তির সাহায্যে কাফির মুশরিকগণও নানা রকম অলৌকিক কার্যাবলী দেখাবার শক্তি অর্জন করে থাকে। তাদের এসকল কার্যাবলী শরীয়তেরত পরিভাষায় "এস্তেদরাজ" বলা হয়ে থাকে। এজন্য শুধুমাত্র কারামাতের নিরীখে কোন ব্যক্তির অলী হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে যাওয়া নিতান্তই বোকামী। আর একটা কথা, কারামতের সংখ্যা দেখে কোন অলীর মর্যাদা নিরূপন করতে যাওয়াটাও কিন্তু খুবই অশোভন ও অযৌক্তিক কাজ।

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী উক্তি

দ্বিতীয় হিজরী শতকের বিশিষ্ট সাধক পুরুষ হযরত আবু ইয়াজিদ তাইফুর ওরফে বায়েজিদ বোস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি (ওফাত ১৩৪ হিজরি) বলেছেন, "সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসারী না হয়ে কেউ ত্বরীকতপন্থী হতে পারে না। শরীয়তকে বাদ দিয়ে কখনো ত্বরীকত ও মারিফাত অর্জন করা সম্ভবপর নয়। আর যদি কেউ সুন্নতের অনুসারী না হয়ে ত্বরীকতপন্থী বলে নিজেকে দাবী করে তবে সে নিশ্চিতরূপে মহা মিথ্যার আশ্রয় নিল।"

হুজুর কেবলা আল্লামা তৈয়্যব শাহ (রহ.)'র উক্তি

বিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কারক ও বিশ্ববরেণ্য সুফি সাধক হাফেজ ক্বারী আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি (জন্ম ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ, ওফাত ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ) বলেছেন, "পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, কিংবা বাতাসে উড়ে বেড়ানো কখনোই কারো অলী হওয়ার পক্ষে প্রমাণ হতে পারে না। মাছ পানিতে ভেসে বেড়ায় আর অতি ক্ষুদ্র পতঙ্গ মাছিও বাতাসে উড়ে যেতে পারে। প্রকৃত কারামত হচ্ছে সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি ইস্তেক্বামাত বজায় রাখা। অর্থাৎ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের প্রতি অবিচল থাকাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় করামাত। আর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অবহেলা করাটাই হচ্ছে গোমরাহী। একবার কোন অলীর দরবারে কয়েকজন মেহমান এসে দীর্ঘ চল্লিশ দিন অবস্থান করে চলে যেতে উদ্যোগী হলো।

ব্যাপার দেখে উক্ত অলী তাদেরকে কাছে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তারা বললো, "হুজুর আমরা আপনার কাছে মুরীদ হতে এসেছিলাম। কিন্তু এ যাবত আপনার কাছে কোন রকম কারামত প্রকাশিত হতে না দেখে আমরা হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে যাচ্ছি।" তখন উক্ত অলী তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি এ যাবত আমাকে সুন্নাতের খেলাফ কোন কাজ করতে দেখেছ?" তারা এর উত্তরে বললো, "না, আমরা আপনাকে সব সময় সুন্নাতের পাবন্দ দেখেছি।" এবার উক্ত অলী তাদেরকে বলেন, "দেখ! এটাই হচ্ছে আমার কারামত।" লোকেরা তাদের ভুল বুঝতে পেরে তাঁর নিকট ক্ষমা চেয়ে মুরীদ হয়ে দেশে ফিরে গেলেন।

কারামত প্রদর্শন করাটা যদিও অলী হওয়ার জন্য দলিল নয়, কিন্তু তবুও কোন অলীর কথা উঠলেই সাধারণ মানুষ স্বভাবতই তাঁর দ্বারা প্রদর্শিত কারামতের কথাই আগে বিবেচনায় আনে। তাই সকলের অশেষ কৌতুহলের দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে গাউসে পাকের (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) কারামতসমূহ নিয়ে কিঞ্চিত আলোচনা করা হলো।

ইমামে রাব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, "যেরূপ অসংখ্য কারামাত হযরত গাউসে পাক সৈয়্যদ আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির কাছ থেকে প্রকাশ পেয়েছে সেরকম আর দ্বিতীয় কোন অলী হতে প্রকাশ পায়নি।"

[মাকতুবাত, ১ম খণ্ড, মাকতুব নম্বর ২১৬]

পৃথিবীর স্বনামধ্য ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় উলামা ও মাশায়িখগণ তাদের শত শত নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে হযরত গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর অসংখ্য কারামাত বর্ণনা করেছেন। আল্লামা নূরুদ্দিন আবুল হাসন শাতনুনী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি রচিত "বাহজাতুল আসরার", শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির আখবারুল আখয়ার ও যুবদাতুল আসার ফী তাখলীসে বাহজাতুল অসার, প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ মোল্লা আলী কারীর (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) অমর গ্রন্থ "নুজহাতুল খাতিরিল ফাতির' এ বড়পীর হযরত গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর শত শত কারামতের কথা অতি নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো। যেমন জন্মের পর পরই পূর্ণ একমাস রমজানের রোযা পালন করা, মায়ের পেট থেকেই আঠার পারা কুরআনের হাফেজ হয়ে দুনিয়ায় তাশরীফ আনা, মুরগীর গোশত খাওয়ার পর হাড্ডি হতে পুনরায় জীবন্ত মুরগীর জন্ম দেয়া ইত্যাদি।

বার বছর পূর্বে বরযাত্রীসহ দজলা নদীতে ডুবে যাওয়া নৌকা সমুদয় মালামাল ও যাত্রী সহ আবার জীবিত উদ্ধার হওয়া। উল্লেখ্য, পূনর্জীবনপ্রাপ্ত উক্ত সৌভাগ্যবান বরের নাম ছিল সৈয়্যদ কবীর উদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর উপাধী ছিল, 'শাহ্ দুলহা দরিয়ায়ী'। ইনি পরবর্তীতে বড়পীর হযরত গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর খেদমতে অত্মনিয়োগ করেন এবং গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর দোয়ার বরকতে বছর হায়াত লাভ করেছিলেন। পরে বড়পীর গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কর্তৃক খিলাফত প্রাপ্ত হয়ে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত হন। ভারতবর্ষে বিশেষত: পাঞ্জাব এলাকায় ইসলামের বাণী প্রচারে তাঁর অবদান রয়েছে। আনুমানিক ১০৬১ হিজরি/ ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে সৈয়্যদ কবীর উদ্দিন শাহ্ দরিয়ায়ী'র ইন্তেকাল হয়। এখনও গুজরাটে তাঁর মাজার শরীফ বিদ্যমান।

সোহরাওয়ার্দীয়া ত্বরীকার প্রবক্তা হযরত শায়খ সিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর রাহমাতুল্লাহি আলায়হি (জন্ম ৫৪৯ হিজরি, ওফাত ৫৮৭ হিজরি) এর জন্মই হয়েছিল বড়পীর হযরত গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর দোয়ার বরকতে। তাঁর মাতা সাহেবানী পুত্র সন্তান লাভের আশায় বড়পীর হযরত গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর শরণাপন্ন হলে হযরত গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর দোয়ার বদৌলতে তার একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পুত্র সন্তান প্রার্থী নাছোড়বান্দা মায়ের পীড়াপীড়িতে অবশেষে বড়পীর হযরত গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তার কোলের সদ্যজাত কন্যা সন্তানটিকে পুত্র সন্তানে পরিবর্তন করে দেন। বড়পীর হযরত গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর নেক দোয়ার ফসল এ সন্তানটি কালে সোহরাওয়ার্দীয়া ত্বরীকার প্রবক্তা হিসেবে বিশ্বখ্যাত হয়েছিল। শুধু তাই নয় বড়পীর হযরত গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি পরবর্তীকালে তাঁকে ইরাকের বোলায়ত ধানে ধন্য করেছিলেন।

শায়খ মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি (জন্ম ৫৬০ হিজরি, ওফাত ৬৩৮ হিজরি) এর জন্মও হয়েছিল হযরত গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর বিশেষ কারামাতের বদৌলতে। তাঁর নিঃসন্তান পিতা মাতা একটি সন্তানের আশায় বড়পীর হযরত গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর নিকট দোয়া প্রার্থনা করলে

তিনি তাঁদেরকে নিজ ঔরস থেকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন। তাই জন্মের পর তাঁর কৃতজ্ঞ মাতা পিতা বড়পীর গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর পবিত্র নামানুসারে এ সন্তানের নাম রাখেন মুহিউদ্দিন। গাউসে পাকের (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) অসীম রূহানী ফয়েজ ও বরকত ধারন করে কালে ইনি একজন বিশ্ব বিখ্যাত দরবেশ সুফি সাধকে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি ফুসুসুল হিকাম সহ বহু সংখ্যক ইসলামী গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। একথা জেনে রাখা দরকার যে, মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করার ক্ষমতা কেবল গাউস শ্রেণীভুক্ত অলীর জন্যই নির্ধারিত। আর বড়পীর হযরত গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি গাউসুস সাক্বালাইন এবং গাউসুল আযম অর্থাৎ সকল গাউসদের অধিপতি।

ধর্মের নব জীবন দানকারী

ইসলাম ধর্ম তাঁর মুবারক হাতেই পেয়েছিল নতুন যুগে, নতুন ভাবে চলার মত প্রাণশক্তি দিক দর্শন। মানুষকে ইসলাম ধর্মের আসল রূপটির সাথে নতুনভাবে পরিচিত করিয়ে দিয়ে অত্যন্ত সার্থকভাবেই তিনি "ইসলামের ত্রাণকর্তার" ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর সূচিত ধর্মীয় সংস্কারসমূহ যুগ যুগ ধরে ইসলামের সমাজ দেহে জমে থাকা ময়লা ও ধুলোবালির জঞ্জাল দুরীভূতি করে নতুন জীবন রসে সঞ্জীবিত করেছিলেন।

১.বাতিল মতবাদসমূহের খণ্ডন

তিনি শিয়া, মুতাজিলা, জহমিয়া ও গ্রীক দর্শন প্রভাবিত বাতিল সম্প্রদায় ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করে জনসাধারণকে ইসলামের সঠিক পন্থা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত-এর অনুসরণের নির্দেশ দেন। ফলে সাধারণ মানুষ ইসলাম ধর্মের শাশ্বত রূপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে সক্ষম হয়ে তা অনুসরণে উৎসাহিত হয়েছিল।

২.ভোগ বিলাসে মত্ত আব্বাসীয় খলীফাদের সদুপদেশ প্রদান

প্রকাশ্য জনসভায় তিনি আব্বাসীয় খলীফাদের অতিরিক্ত বিলাস ব্যসন ও অনৈসলামী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে তাঁদেরকে সদুপদেশ প্রদান করেন। ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী বাগদাদের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে সেখানে আসেন ৪৮৮ হিজরিতে। সে বছরই আব্বাসীয় খলীফা আল মুসতাজহির বিল্লাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরবর্তী প্রায় পৌনে একশ বছর ধরে আব্বাসীয় বংশের উত্থান-পতন, অপ্রয়োজনীয় বিলাস ব্যসনে গা ভাসিয়ে দেয়া এবং তাঁদের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপসমূহ খুবই কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। খলীফা আল মুসতানজিদ বিল্লাহ্ ও আল মুকতাদী বিআমরিল্লাহ্ তাঁর পরামর্শ অনুসরণ করে চললেও অপারাপর খলীফাদের প্রায় সকলেই ছিলেন তাঁদের পূর্বসুরীদের ন্যায় ভোগ-বিলাস, অকর্মন্য, দায়ীত্বজ্ঞানহীন ও সেচ্ছাচারী।

৩.মাদরাসায় অধ্যাপনা

বাবুল আজাজ মাদরাসায় তিনি সুদীর্ঘকাল অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। এ সময় তিনি সেখানে আগত তালেবে ইলমদেরকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার আলো বিকশিত করে তুলেছিলেন। যারা পরে বহির্বিশ্বে ইসলামের নিবেদিত প্রাণ সৈনিক হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে দ্বীন ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন।

৪. ওয়াজ নসীহত

প্রকাশ্য ওয়াজ মাহফিলে সাধারণকে গুনাহের কার্যকলাপ হতে তাওবা করে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে জীবনযাত্রা পরিচালনার আহ্বান জানান এবং আল্লাহর আযাবে গ্রেফতার হবার বিষয়ে সাবধান বাণী প্রদান করেন।

৫. ধর্মীয় পুস্তকাদি রচনা

তিনি শুধু মুখে মুখে বক্তৃতা দিয়েই জনগণকে ইসলামের বিধিবিধান পালনের বিষয়ে সচেতন করে ক্ষান্ত হননি। ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি গবেষণাধর্মী মৌলিক পুস্তকাদি রচনা করেছেন। এ গ্রন্থগুলো এখনও শত মত ও পথের ভিড়ে দিশেহারা মানুষেকে সুপথ প্রদর্শনের জন্য আদর্শস্থানীয় গ্রন্থ বলে বিবেচিত।

তাঁর রচিত ধর্মীয় পুস্তকাদি

১. গুনিয়াতুত্তালেবীন- এখানে ঈমান- আক্বিদা, আখলাক ও দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় আমলের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে শিয়া, মুতাজিলা, জহমিয়া প্রভৃতি বাতিল সম্প্রদায়ের মতবাদসমূহ যুক্তি প্রমাণ সহকারে খণ্ডন করা হয়েছে।

২. ফতহুল গয়ব- এটি বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত তাঁর মূল্যবান ভাষণসমূহের সংকলন।

৩.আল ফাতহুর রাব্বানী - আধ্যাত্মিক বিষয়াদি নিয়ে এ গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. কাসীদায়ে গাউসিয়া শরীফ- হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কাসীদায়ে গাউসিয়া শরীফকে বড়পীর হযরত সাইয়্যিদুনা গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর প্রেমের পরিচয় বলে উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য কসিদাটি তাঁর রচিত আধ্যাত্মিক ভাব সম্পন্ন একটি অতি উচ্চাঙ্গের কবিতা

হিসেবে সুধীজন কর্তৃক বিবেচিত ও বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। মূলত: এ কসিদাটি ৩২ শ্লোক সম্বলিত এক ধরনের আরবী গীতি কবিতা। ভাবগাম্ভীর্য, উপমার প্রয়োগ ও উপস্থাপনা তথা রচনাশৈলীর সাবলীল কসিদাটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ভাবৈশ্বৈর্য্যের গতিময়তা ও কবিতার আকর্ষণ। সুরলহরীর অসাধারণ ঐক্যতান ছন্দায়িত হিল্লোল কাসিদাটির শেষ চরণ পর্যন্ত প্রবহমান। কিছুটা আত্ম প্রশান্তিমূলক হলেও কসিদাটি তাঁর সুগভীর আল্লাহ্ প্রেম মহিমায় প্রোজ্জ্বল। অত্র কসিদায় যদিও হযরত গাউসুল আযম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি নিজ উপলব্ধি সম্পর্কেই লিখেছেন, তবে প্রকৃতপক্ষে এটা তিনি আল্লাহর ইশক, মুহাব্বত ও প্রেমে ফানাফিল্লাহ্ বা নিমজ্জিত অবস্থাতেই আবৃত্তি করেছেন বলে বিশেষজ্ঞ মহলের দৃঢ় ধারনা। যাই হোক কসিদাটি যে, এক পবিত্র আধ্যাত্মিক ভাবরসে ভরপুর তাতে দ্বিমতের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। বস্তুত কসিদায়ে গাউসিয়ায় লিখিত পংক্তি মালায় তাঁর খোদা প্রেমিক ও আবেগ বিহ্বল চিত্তের যথার্থ স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। সাধনালোকের যে উচুতম মার্গে তিনি আরোহণ করেছিলেন, তথা থেকে তিনি বিশ্বজগত ও নিজের অবস্থান সম্পর্কে বাস্তব অবস্থার বিবরণ এখানে দিয়েছেন। দৈনন্দিন অযীফা হিসেবেও অনেকেই ভক্তিভরে এ কসিদাটির আমল করে থাকেন। একটি সামান্য কবিতার পক্ষে এতদাপেক্ষা অধিকতর কাম্য আর কী হতে পারে?

৬.তার শত সহস্র মুরীদান, ভক্তশ্রেণী ও আপামর মুসলিম জনসাধারণের অনুসরনের জন্য তিনি অত্যন্ত সহজ পন্থায় আল্লাহর মনোনীত দ্বীন পালন করার উপায় দেখিয়ে গিয়েছেন। আর এ পথ অনুসরণ করে যে কেউ আল্লাহ্ পর্যন্ত খুব সহজেই পৌঁছাতে পারে। তাঁর প্রবর্তিত এ ত্বরীকার নাম হচ্ছে ''ত্বরীকায়ে আলীয়া ক্বাদেরিয়া''। তিনি নিজে কঠোরভাবে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে জীবনযাত্রা পরিচালনা করতেন এবং তাঁর অনুসারীদেরকেও সঠিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহ্র বিধিবিধান অনুসরণ করে তাদের জীবনযাত্রা পরিচালনা করার জন্য নির্দেশ দিতেন। তাঁর ত্বরীকার অনুসারীদের জন্য তিনি 'গিয়ারভী শরীফ' ও 'খতমে গাউসিয়া শরীফ' নামে অতি মুবারক দু'টি খতমের ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। প্রতি চন্দ্র মাসের ১১ তারিখে গাউসে পাকের (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) মুরীদানরা একত্রিত হয়ে এ 'গিয়ারভী শরীফ' এর খতম আদায় করে থাকে। পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফে উল্লিখিত দোয়ায়ে মাসুরা সম্বলিত এ মুবারক খতম সত্যিই গাউসে পাকের (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এক মহা নেয়ামত। খালেস নিয়তে এ মহা বরকত পূরিপূর্ণ খতম আদায় করলে অশেষ নেকী হাসিল হয়। মনের মাকসুদ পূর্ণ হয়। বিপদাপদ দূরীভুত হয়। ত্বরীকত পন্থীরা এ মুবারক খতমকে গাউসে পাকের (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) পক্ষ থেকে উপহার হিসেবেই গ্রহণ করে নিয়েছেন। তাঁর প্রবর্তিত কাদেরিয়া ত্বরীকা এ যাবৎ প্রবর্তিত ত্বরীকা সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ত্বরীকা হিসেবে বিশ্বব্যাপী নন্দিত হয়েছে। তিনিই প্রথম তরীকাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন। দ্বীনি শিক্ষার অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাঁর ত্বরীকাই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাঁর সূচিত পথ ধরেই সমুদয় শায়খগণ তাঁদের ত্বরীকাসমূহ প্রর্বতন করতে উৎসাহিত হয়েছেন যা সাধারণ জনগণকে সত্যিকার ইসলামী জীবনধারার সাথে সরাসরি সম্পর্ক করতে সক্ষম হয়েছে।

এলো পরপারের ডাক

মানুষের জীবন যেমন সত্য, তেমনি আরেক মহাসত্য মৃত্যু। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ পাক বলেছেন, ''কুল্লু নাফসীন যায়ীকাতুল মাউত'' অর্থাৎ প্রত্যেকটি প্রাণীকেই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এ যে নিয়তির অমোঘ বিধান। একে স্বীকার করার কোন উপায় নেই। কবি কি সুন্দর কথা বলেছেন, ''মৃত্যু শরবত প্রত্যেক মানুষকেই পান করতে হবে, কবরের ঘরে প্রত্যেকটি মানুষকেই যেতে হবে। জাগতিক নিয়মে তাই হযরত সাইয়্যিদিনা গাউসে পাকেরও (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এ পৃথিবী থেকে যাওয়ার ডাক এলো। আরবী বর্ষপঞ্জীর হিসেবে সেদিন ছিল মতান্তরে ৫৬১ হিজরি ১১ই রবিউস সানী। সানন্দ চিত্তে তিনি মেনে নিলেন নিয়তিকে। কারণ এ মাধ্যমেই খুলে যাবে মহান রবের সাথে তাঁর মহামিলনের দ্বার। তাঁর কাছে আগত মৃত্যুদূত যেন এক চির প্রতিক্ষীত আনন্দময় শুভ বার্তার বাহক। তাই বিনা বাক্য ব্যয়ে কলেমা শাহাদাত পাঠ করতে করতে মহান রবের সাথে মহামিলনের আশায় ছুটে চললো তার পবিত্র আত্মা। বিদায় প্রিয় বাগদাদ! বিদায় হে! বাগদাদবাসী! তাঁর কি আনন্দ! এক নীড়হারা বেহেশতী পাখী আজ খুঁজে পেয়েছেন তাঁর আপন নিবাস, চিরস্থায়ী ঠিকানা। মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে আমাদের সকাতর প্রার্থনা, হে রব যার নেক দৃষ্টির উসিলায় চোর আবদালে পরিণত হয়েছিল, সে মহান পবিত্র নামের উসিলায় তুমি আমাদের মৃত কুলবকে পুনরায় জীবিত করে দাও। যাঁর দোয়ার বরকতে তুমি নিঃসন্তানকে সন্তান দ্বারা

ধন্য করেছিলে সে পুন্যবান সত্তার বদৌলতে তুমি আমাদেরকে বেহেশত দান কর। আমীন! সুম্মা আমীন!

সহায়ক গ্রন্থাবলীর তালিকা

১.দি স্পিরিট অব ইসলাম- সৈয়দ আমীর আলী, বঙ্গানুবাদ - ড. রশীদুল আলম।

২.সুফি দর্শন- ড. ফকীর আবদুর রশীদ।

৩.সুফি তত্ত্বের মর্মকথা- চৌধুরী সামসুর রহমান।

৫.গাউসুল আযম জিলানী (রহ.) সংস্কার ও ত্বরীকা, মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার।

৬.সুফিবাদ ও আমাদের সমাজ- ড. কাজী দ্বীন মুহাম্মদ ও অন্যান্য।

৭. তাসাউফ সঞ্জীবনী- মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন ভুঞা।

৮. ইসলামের আলোকে সুফিবাদ- ডা. কাজী আবদুল মোনয়েম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা।

৯. তাযকেরাতুল আউলিয়া- শায়খ ফরীউদ্দীন আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলায়হি।

১০. শানে গাউসুল আযম (রহ.)-মুফতি কাজী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ, চট্টগ্রাম।

১১.জীলান সূর্যের হাতছানি- মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ, সেরহিন্দ প্রকাশন, ঢাকা।

১২.গেয়ারভী শরীফ কি ও কেন? মাওলানা বদিউল আলম রিজভী, চট্টগ্রাম।

১৩. কারামতে গাউসুল আযম- অধ্যক্ষ হাফেজ এম এ জলিল।